ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

গোলাপ মুনীর

ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন বা ডিজিটাল রূপান্তর বলতে আমরা কী বুঝি? ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন হচ্ছে সমগ্র মানবসমাজে আসা এক ধরনের পরিবর্তনের নাম, যে পরিবর্তন আসে ডিজিটাল টেকনোলজির ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। সোজা কথায়, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার সূত্রে মানবসমাজে আসা পরিবর্তনের নামই ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন। ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনকে ভাবা যেতে পারে ডিজিটাল টেকনোলজিকে আত্মস্থ করার তৃতীয় স্তর : ডিজিটাল কমপিট্যান্স→ডিজিটাল ইউজেস→ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন। ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন স্তরের অর্থ ডিজিটাল ইউজেসের মাধ্যমে অন্তর্নিহিতভাবে সক্ষমতা আনতে প্রচলিত পদ্ধতিকে জোরদার করা বা সহায়তা দেয়ার পরিবর্তে বরং নতুন ধরনের উদ্ভাবনা ও ডোমেইন বিশেষের মধ্যে সৃজনশীলতা আনা। সঙ্কীর্ণ অর্থে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনকে অভিহিত করা যায় 'গোয়িং পেপারলেস' ধারণা হিসেবে।

ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন প্রভাব ফেলে ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে ও পুরো সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যেমন– সরকার, গণযোগাযোগ, শিল্পকলা, উৎপাদন শিল্প, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, বিনোদন, পরিসেবা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিজ্ঞান। এর বাইরে এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাব নেই। একটিমাত্র প্রতিবেদনে সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাবের বিষয়টি তুলে ধরা নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব। তাই বক্ষ্যমান প্রতিবেদনে আমরা শুধু শিল্পক্ষেত্রে তথা ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা সীমিত রাখব। উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের একটি বহুবর্ষী প্রকল্প রয়েছে। এ প্রকল্পের নাম 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অব ইন্ডাস্ট্রিজ'। সংক্ষেপে 'ডিটিআই'। এই ডিটিআই প্রকল্পের মাধ্যমে বিজনেস ও সোসাইটিতে ডিজিটালাইজেশন তথা ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন যেসব সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে আসছে, তা-ই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে অব্যাহতভাবে। এর ফলে আমরা শিল্পক্ষেত্রে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনকে আরও ভালোভাবে জানতে পারছি। এই প্রতিবেদনে সেইসব জানা-বোঝা তুলে ধরার প্রয়াস বিদ্যমান।

শিল্প খাতে ও সমাজে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের ফলে শিল্প খাতে ও সমাজে মূল্য সংযোজনের অপরিমেয় সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডিজিটাল টেকনোলজির দ্রুত পরিবর্তন আমাদের পৃথিবীকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। অগ্রসর মানের প্রযুক্তির দামের ক্রমাবনতি ব্যবসায়, কাজকর্মে ও সমাজে নতুন নতুন বিপ্লবের জন্ম দিচ্ছে। ২০০৭ সালে একটি স্মার্টফোনের দাম ছিল ৪৯৯ ডলার। সেখানে একই স্পেসিফিকেশনের ও মডেলের টপ-অব-দ্য-রেঞ্জ স্মার্টফোনের দাম ২০১৫ সালে নেমে এসেছে মাত্র ১০ ডলারে। মোবাইল, ক্লাউড, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেন্সর ও অ্যানালাইটিক প্রযুক্তির যৌথ প্রভাবে প্রযুক্তির অগ্রগমন চলছে উল্লেখযোগ্যভাবে। টেকনোলজি এখন একটি মাল্টিপ্লায়ার বা গুণিতক।

ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন বয়ে এনেছে ইন্ডাস্ট্রি বা শিল্প খাতে মূল্য সংযোজনের অপার সুযোগ। ফরচুন পত্রিকা ঘোষিত সেরা ৫০০ কোম্পানির প্রতিটি বিগত দুই দশকে গড়ে ১০০ কোটি ডলারের মূল্য সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ করে ডিজিটাল টেকনোলজি সৃষ্টি করছে মুনাফার নতুন নতুন পথ। একই সাথে ডিজিটালাইজেশন সমভাবে সমাজে বয়ে আনছে নানা উপকার। অটোনোমাস যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার ও ইউজেস-বেইজড গাড়িবীমা ২০২৫ সালের মধ্যে বাঁচাতে পারে ১০ লাখ মানুষের প্রাণ। এখনও ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন বিষয়টি মানুষ ভালোভাবে বুঝে না। মূল্য সংযোজনের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এখনও নানা মিথের কথা উচ্চারিত হয়। তাই সমাজ ও শিল্প খাতে ডিজিটালাইজেশনের উপকারিতা উপলব্ধি করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে।

৬৫টিরও বেশি ডিজিটাল উদ্যোগের ওপর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'ভ্যালু অ্যাট স্টেক' বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সোসাইটি ও ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের সম্মিলিত ভ্যালু আগামী ১০ বছরে বাড়বে ১০০ ট্রিলিয়ন ডলার। কী করে এন্টারপ্রাইজগুলো ইন্ডাস্ট্রি ও সোসাইটিতে ডিজিটালাইজেশনের জন্য ভ্যালু সংযোজন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাতে পারে, তা নিরূপণের জন্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ডিটিআই প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখেছে চারটি ক্রস-ইন্ডাস্ট্রি থিম : ডিজিটাল কনজাম্পশন, ডিজিটাল এন্টারপ্রাইজ, সোসাইটাল ইমপ্লিকেশন এবং প্লাটফর্ম গভর্ন্যান্স। আলাদা আলাদাভাবে ও একসাথে কাজ করে এসব থিম উপস্থাপন করে নাটকীয় পরিবর্তন।

আমরা এখন মুখোমুখি নানা সামাজিক চ্যালেঞ্জের। বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। শিল্প খাতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন নীতিনির্ধারক, অর্থনীতিবিদ ও শিল্প খাতের নেতাদের মধ্যে এর সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আমরা দেখেছি ডিজিটালাইজেশন ব্যাপকভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই শিল্প খাতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন কীভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুর ওপর, যেমন– চাকরি, বেতন বা মজুরি, বৈষম্য, স্বাস্থ্য, সম্পদ দক্ষতা ও নিরাপত্তার ওপর, তা নিয়ে উদ্বেগের মাত্রা বাড়ছে।

এ প্রেক্ষাপটে শিল্প খাতের ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন প্রোগ্রাম সামনে নিয়ে এসেছে তিনটি প্রশ্ন : আজকের সমাজ যে বড় বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, এসবের ওপর শিল্প খাতের ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন কি প্রভাব ফেলতে পারে? ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের যাতে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে, সেজন্য কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা দরকার? এবং ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের ইতিবাচক অবদান নিশ্চিত করতে হলে বিজনেসগুলোকে নিকট সময়ে কী কী বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে?

ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের ভবিষ্যৎ প্রভাব সম্পর্কে একটি সাক্ষ্য-প্রমাণভিত্তিক নতুন বিতর্ক শুরু করায় সহায়তা করতে ডিটিআই পরিচালনা করে ভ্যালু অ্যাট স্টেকের একটি ব্যাপকভিত্তিক কোয়ান্টেটিভ অ্যানালাইসিস। এই বিশ্লেষণ চলে চারটি শিল্প খাতের ভ্যালু অ্যাট স্টেকের ওপর : অটোমেটিভ, কনজ্যুমার, ইলেকট্রিসিটি এবং লজিস্টিকস। প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা শিল্প খাতে ডিজিটালাইজেশনের প্রভাবে ভ্যালু প্রজেকশনের বিষয়টি ক্যালকুলেশন করে দেখেছে। ক্যালকুলেট করছে সমাজে বিকাশমান ভ্যালু সোর্স। সময়ের সাথে এসব উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত ও পরিশোধিত করা হতে পারে। ডিটিআইয়ের প্রথম বছরের উদ্যোগে তিনটি মুখ্য থিম বা ধারণার ওপর আলোকপাত করেছে :

০১. এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড স্কিল : বর্তমানে অনুমিত হিসাব মতে, ডিজিটালাইজেশনের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে চাকরিহারাদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২০ লাখ থেকে ২০০ কোটি জন। চাকরির ওপর ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাব সম্পর্কে একটি বড় ধরনের অনিশ্চয়তা আছে। উদ্বেগ আছে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাবে বেতন কমে যাওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া নিয়ে।

০২. এনভায়রনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি : আমরা এখন পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড উদগীরণ প্রবৃদ্ধি ও সম্পদ ব্যবহার থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আলাদা করতে পারিনি। এটি আমাদের ব্যর্থতা। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রবণতা হচ্ছে : বিশ্ব জিডিপিতে যেখানে ১ শতাংশ বেড়েছে, সেখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড উদগীরণ বেড়েছে ০.৫ শতাংশ। আর সম্পদের তীব্রতা তথা রিসোর্স ইনটেনসিটি বেড়েছে ০.৪ শতাংশ। বর্তমান ধারায় বিজনেস অনুশীলন চললে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যকার ৮০০ কোটি মেট্রিক টনের ঘাটতি পূরণ করা যাবে ২০৩০ সালের মধ্যে।

০৩. ট্রাস্ট : সোশ্যাল মিডিয়া, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগস এবং ইউজার-জেনারেটেড ওয়েবসাইট (যেমন– TripAdviser) ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ব্যবসায়ে ট্র্যান্সপারেন্সি বাড়াতে এবং তথ্যের বৈসাদৃশ্য দূর করতে। তা সত্ত্বেও এডলম্যান ট্রাস্ট ব্যারোমিটার মতে, সব প্রযুক্তিভিত্তিক খাতে ২০১৫ সালে ট্রাস্টের পতন ঘটেছে। মুখ্য উদ্বেগের ক্ষেত্র হচ্ছে ডাটা প্রাইভেসি ও সিকিউরিটি। যে উপায়ে প্রতিষ্ঠানগুলো টেকনোলজি ব্যবহার করছে, তা নিয়ে প্রাইভেসি ও সিকিউরিটি নিয়ে উদ্বেগের বাইরে আরও বিস্তৃত নৈতিক প্রশ্ন আছে। আর তা এসব প্রতিষ্ঠানের ট্রাস্ট কমাতে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এসব ব্যাপক জটিল চ্যালেঞ্জ থাকার পরও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বিশ্লেষণ বলছে, ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনে ইতিবাচক অবদান রাখার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক খাতে সম্ভাবনাময় ইতিবাচক অবদান সৃষ্টির জন্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম তিনটি মুখ্য ধারণার পরামর্শ দিয়েছে। ▶

০১. মেশিন যুগের জন্য জনশক্তি তৈরি : ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে লজিস্টিকস ও ইলেকট্রিসিটি শিল্পে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এ ক্ষেত্রে বিশ্বে ৬০ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব। তবে মোট ইতিবাচক প্রভাবটা পড়বে শিল্প খাতে। যেসব ইন্ডাস্ট্রিতে সমীক্ষা চালানো হয়েছে, সেগুলোতে দেখা গেছে অটোমেশন এমন কিছু কাজকে অপসারিত করবে, যা আগে লোক দিয়ে প্রচলিতভাবে করানো হতো। যেমন– লজিস্টিকসে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বাস্তবায়ন সুযোগ দেবে ক্রস-বর্ডার ট্রেডিংয়ের এবং লজিস্টিকস রুটসের ক্রাউড সোর্সিং একই সাথে ২০২৫ সালের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে ৪০ লাখ কর্মসংস্থান। এর ফলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এখন যত লোক কাজ করছে, তারচেয়ে ৮.৪ শতাংশ কর্মসংস্থান তখন বেড়ে যাবে। তা সত্ত্বেও নতুন সরবরাহ সক্ষমতা বাড়লে, যেমন– ড্রোন, অটোনোমাস ট্রাক ও শেয়ারড ওয়্যারহাউস আসলে বিদ্যমান অনেক লজিস্টিক জব হুমকির মুখে পড়বে। এর মধ্য দিয়েই ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন মেশিন যুগের জন্য তৈরি করবে একটি দক্ষ জনবল।

০২. টেকসই দুনিয়ায় উত্তরণ : সমীক্ষিত শিল্পে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট ২৬০০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন উদগীরণ এড়ানো সম্ভব হবে।

প্ল্যাটফরম ইকোনমি

প্ল্যাটফরমগুলো এখন অন্য ফার্মগুলোকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। প্ল্যাটফরমগুলো এখন ডিজিটাল ল্যান্ডস্কেপে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। তাই এখন প্রয়োজন প্ল্যাটফরম ইকোনমি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ন্যান্স মডেল। এর সূচনা থেকেই ইন্টারনেটের তিনটি অপারেশনাল লেভেলে বা পরিচালনাগত স্তরে কোনো না কোনো ধরনের গভর্ন্যান্সের প্রয়োজন ছিল। এই তিনটি অপারেশনাল লেভেল হচ্ছে : ফিজিক্যাল (ইনফ্রাস্ট্রাকচার), লজিক্যাল (ডিভাইস-সার্ভার কমিউনিকেশন) এবং ইকোনমিক/সোশ্যাল (ইউজারস ইন্টারেক্টিং উইথ ইন্টারনেট)।

এই তিনটি স্তরের প্রতিটিই সামনে আনে অনন্য রেগুলেশন চ্যালেঞ্জ ও গভর্ন্যান্স ইস্যু, যেগুলো সমাধানে প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা। ইকোনমিক/সোসাইটাল (টপ) লেয়ার হচ্ছে সবচেয়ে জটিল ধরনের একটি স্টেকহোল্ডার ইন্টারেকশন পারস্পেকটিভ, আর বর্তমানে এটিই সবচেয়ে কম নিয়ন্ত্রিত। আর এখানেই গুগল, অ্যামাজন ও অ্যাপল প্ল্যাটফরম বিদ্যমান রয়েছে। বিভিন্নভাবে এসব প্ল্যাটফরম কনজ্যুমারদের কাছে দৃশ্যমান। এর মধ্যে আছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম। যেমন– অ্যান্ড্রয়িড, আইওএস, কিন্ডল ফায়ার, থার্ডপার্টি ডেভেলপার কমিউনিটিজ (যেমন– গুগল অ্যাপল মার্কেটপ্লেস) এবং ইউজার-ফ্রেন্ডলি অ্যাপস (যেমন– গুগল ম্যাপস, অ্যাপল মিউজিক ও অ্যামাজন ডটকম)।

শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফরমগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাজারশক্তি অর্জন করেছে। গত সাত বছরে গুগল, অ্যামাজন ও অ্যাপলের বাজার মূলধন প্রতিবছর বেড়েছে গড়ে ২২ শতাংশ। সে তুলনায় 'এসঅ্যান্ডপি ৫০০' কোম্পানির বেড়েছে মাত্র ১১ শতাংশ। বৈশ্বিকভাবে সবচেয়ে সফল টেকনোলজি কোম্পানিগুলো দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে গত ১০ বছরে। আর এসব 'সুপার প্ল্যাটফরমগুলো ইনোভেশন, প্রডাকটিভিটি, কনজাম্পশন ও এন্টাপ্রিনিউয়ারশিপের ক্ষেত্রে সমাজকে উপকৃত করেছে। বড় মাপের তিন ধরনের প্ল্যাটফরম বেনিফিট হচ্ছে : ০১. মানুষের সাথে যোগাযোগের উন্নয়ন (যেমন– হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে বন্ধুর কাছে ম্যাসেজ পাঠানো অথবা একটি অনলাইন প্রোফাইল গড়ে তোলার জন্য লিঙ্কডইনের ব্যবহার)। ০২. কার্যকরভাবে ইনফরমেশন সংগ্রহ ও বিনিময় করা (যেমন– দুই স্থানের মধ্যে ড্রাইভিং টাইম নির্ণয়ের জন্য গুগল ম্যাপ ব্যবহার অথবা প্রণোদনামূলক ইউটিউব ডাউনলোড করা)। ০৩. কার্যকরভাবে চাহিদা ও সরবরাহে সামঞ্জস্য বিধান (যেমন– একটি ট্যাক্সি বুকিং করা বা ইনস্টাকারের মধ্যে এক ঘণ্টায় সরবরাহ পাওয়ার জন্য অনলাইন শপিং)।

তা তত্ত্বেও অনেক প্ল্যাটফরম এখন নিখরচায় অথবা কম খরচের সার্ভিস ব্যবহার করতে শুরু করেছে এদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে। এর মধ্যে 'প্ল্যাটফরম লকইন' হচ্ছে সবচেয়ে কমন একটি (ভেন্ডর লকইনের মতো)। এমনি একটি ইস্যু হচ্ছে গুগল। গুগল ২০১০ সাল থেকে আইনি লড়াই করছে ইউরোপিয়ান কমিশনের সাথে। অভিযোগ হচ্ছে, এটি সার্চ রেজাল্ট বিকৃত করেছে এর ভার্টিকল সার্চ সার্ভিসের (যেমন– গুগল ট্র্যাভেল ও গুগল শপিং) অনুকূলে, প্রতিযোগীদের একই ধরনের সার্ভিসের প্রতিকূলে।

এ ধরনের ভবিষ্যৎ ইস্যু মোকাবেলায় প্ল্যাটফরম ইকোনমির জন্য এরই মধ্যে প্রস্তাব করা হয়েছে চারটি স্বতন্ত্র গভর্ন্যান্স মডেল : ০১. নো ওয়ান, ০২. অ্যা গভর্নমেন্ট অথবা অ্যা সেট অব গভর্নমেন্টস, ০৩. অ্যা প্ল্যাটফরম ইটসেলফ এবং ০৪. অ্যা গ্লোবাল মাল্টি-স্টেকহোল্ডার কমিউনিটি।

আগামী দিনে প্ল্যাটফরম গভর্ন্যান্সের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে গ্লোবাল প্লেয়ারদের মধ্যে এমনভাবে সহায়তা গড়ে তোলা, যাতে উঁচুমাত্রার ইন্টারঅপারেবিলিটি বজায় থাকে। এমনটি ডিজিটাল ব্যবহারকারীরা অতীতে উপভোগ করে আসছেন। 'ওয়ার্ল্ড গার্ডেনস' অথবা 'মিনি ন্যাশনাল ইন্টারনেট' হচ্ছে সমস্যাকর। কারণ, এগুলো প্ল্যাটফরমের কিছু মুখ্য বেনিফিটকে ধ্বংস করে দেয় (গ্লোবাল ইনফরমেশন শেয়ারিং, কানেকটিভিটি ও ট্রেড)। অপ্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয় এই অসুবিধা। যদি একটি মাল্টি স্টেকহোল্ডার মডেল গ্রহণ করা হয়, প্ল্যাটফরমগুলোর প্রয়োজন হবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকার ও টেকনিক্যাল কর্মীদের নিয়ে একসাথে কাজ করার। আর এভাবেই প্ল্যাটফরম ইকোনমির পুরো উপকার পাওয়া নিশ্চিত হবে।

অনেক প্রতিষ্ঠান এখন প্ল্যাটফরমগুলোকে স্বাগত জানাতে শুরু করবে। হয় এরা নিজেরাই সৃষ্টি করবে নিজেদের প্রোপ্রাইটরি প্ল্যাটফরম, নয়তো ঢুকে পড়বে শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফরমের আগে থেকেই থাকা ইকোসিস্টেমে। এসব প্রতিষ্ঠান প্ল্যাটফরমকে স্বাগত জানাবে ইনোভেশন, নতুন গ্রাহক পাওয়া ও মুনাফা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে তোলার কাজকে ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে। অনেক ননটেক ফার্ম ভ্যালু-ক্রিয়েটিং উদ্যোগ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। এসব ফার্মের জন্য সহায়ক হতে পারে প্ল্যাটফরম ইকোনমি। ইউনিলিভার সম্প্রতি প্রমাণ করেছে তা সম্ভব।

লজিস্টিকে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

লজিস্টিককে মৌলিকভাবে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন একটি হুমকি। কিন্তু এর অদক্ষতা কমিয়ে এনে এবং এর ওপর পরিবেশগত প্রভাব সঙ্কুচিত করে এটি এই শিল্পের জন্য উপকারীও হতে পারে। বিগত দুই দশকে বিশ্বে সংঘটিত হয়েছে ইন্টারনেট বিপ্লব। ফলে সময়ের সাথে আমাদের প্রতিদিনের জীবন ক্রমবর্ধমান হারে হয়ে উঠেছে ডিজিটাল। ই-মেইল ও ডিজিটাল ডাউনলোড বিদায় করছে ভৌত পণ্য। এটি লজিস্টিক শিল্পে হতে পারত একটি ধ্বংসকর ধাক্কা। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে উল্লেখ করার মতো কিছু। আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি প্যাকেজ জাহাজে করে চালান হচ্ছে। এখন একদিনে সাড়ে আট কোটি প্যাকেজ ও ডকুমেন্ট বিশ্বব্যাপী সরবরাহ হচ্ছে।

জনসংখ্যাগত ও ডিজিটাল প্রবণতা একসাথে মিলে প্রবৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলছে। কিন্তু লজিস্টিক বিজনেস গ্লোবাল শিপমেন্টের বিস্ফোরণের ফসল উপভোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। লজিস্টিক অন্যান্য শিল্পের তুলনায় ধীরগতিতে সূচিত করেছে ডিজিটাল ইনোভেশন। ডিজিটাল অ্যাডাপশনের এই ধীরতর গতির হার সৃষ্টি করেছে অপরিমিত ঝুঁকি। যদি এসব ঝুঁকি এড়িয়ে ▸

চলা হয়, তবে তা এমনকি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়েও ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনতে পারে।

ডিজিটাল টেকনোলজি বিভিন্ন শিল্প খাতে বয়ে এনেছে বিপ্লব। আর অন্যান্য শিল্পের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে লজিস্টিক শিল্পের। যেমন– রিটেইল শিল্প। তাই লজিস্টিক শিল্পকে ঘিরে ডিজিটাল ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসার সম্ভাবনা বাড়ছে। উদাহরণ টেনে বলা যায়, ই-কমার্সের উত্থানের ফলে লাস্ট-মাইল ডেলিভারি মার্কেটে এটি এখন একটি নতুন ডিজিটাল অতিথি। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, ডিজিটাল প্ল্যাটফরম ক্রমবর্ধমান হারে লজিস্টিক শিল্পে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এর ফলে ছোট কোম্পানিও বিশ্বব্যপী পদচারণার সুযোগ পাবে। প্রতিযোগিতা করতে পারবে এ খাতের প্রতিষ্ঠিত বড় বড় কোম্পানির সাথে। বিগত কয়েক বছরে প্রতিনিধিত্বকারী গ্লোবাল প্ল্যাটফরম গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা লজিস্টিকের ব্যাপারে গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা পাল্টে দেবে। তখন মূল সিদ্ধান্তের বিষয় হবে– কোনো লজিস্টিক শিল্প সত্যিকারের লাভজনক বা ক্ষতিজনক হবে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের এক বিশ্লেষণ মতে– ২০২৫ সালের মধ্যে এই ইন্ডাস্ট্রির ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের ফলে লজিস্টিক প্লেয়ারদের দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের ভ্যালু ঝুঁকির মধ্যে আছে। অপরদিকে তা বয়ে আনবে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারের মতো সামাজিক উপকার। জ্বালানি খরচ ও কার্বন উদগীরণ কমিয়ে এবং দক্ষতা বাড়িয়ে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন এ খাতে অধিকতর উপকার বয়ে আনতে পারে।

মিডিয়া শিল্পে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

নানা ধরনের ডিজিটাল ওয়েভের মাধ্যমে এরই মধ্যে মিডিয়া শিল্পে ব্যাপক ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ঘটেছে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মিডিয়া এন্টারপ্রাইজগুলোকে তাদের কাজের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে প্রযুক্তিকে। মিডিয়ার প্রত্যেক নতুন শ্রোতা-পাঠক-দর্শকের কাছে তাদের কনটেন্ট গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইলে প্রযুক্তিকে লজিস্টিকের কেন্দ্রে নিয়ে আসা ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই। প্রায় ২০ বছর আগে প্রকাশিত একটি লেখার শিরোনাম ছিল 'কনটেন্ট ইজ কিং'। সে সময় আমাদের কারও ই-মেইল অ্যাকাউন্ট ছিল না। উল্লিখিত লেখায় তখন কিছু সাহসী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রিডিকশন ছিল : 'মাচ অব দ্য রিয়েল মানি উইল বি মেইড অন দ্য ইন্টারনেট'। গত দুই দশকের বেশিরভাগটায় এর লেখক বিল গেটসের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল অবিস্মরণীয়ভাবে যথার্থ সঠিক।

কিন্তু আজকের চিত্রটা আরও জটিল। আজ যখন মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির ডিজিটাল প্রবণতা নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে, তখন এই শিল্প বেশ কয়েকটি ডিজিটালাইজেশন ওয়েভের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এসেছে ফাইল শেয়ারিং, স্ট্রিমিং, সোশ্যাল মিডিয়া ও মোবাইল। আজ বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের কনটেন্টে ঢুকে পড়তে পারছে। সোশ্যাল মিডিয়া, ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস ও স্মার্টফোন অ্যাপগুলো আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রতিযোগিতা করে চলেছে। প্রতি সেকেন্ডে গিগাবাইটের পর গিগাবাইট কনটেন্ট সৃষ্টি করা হচ্ছে। ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য মিডিয়া কোম্পানিগুলো 'টুথ-অ্যান্ড-ক্লো ব্যাটল' জারি রেখেছে।

এই হাইপারকমপিটিটিভ মার্কেটে তথা অতি প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভালো কনটেন্ট এখনও পর্যাপ্ত নয়। মিডিয়া এন্টারপ্রাইজগুলোকে এখন মনোযোগী হতে হবে উঁচুমানের ইউজারদের উপযোগী কনটেন্ট তৈরিতে। এদেরকে তৈরি করতে হবে কাস্টমাইজড কনটেন্ট। এগুলোর দর্শনযোগ্যতার মানও বাড়াতে হবে। সঠিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে সঠিক প্রেক্ষাপটে এর উপস্থাপনের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর পুরো ব্যবসায়ের যথাযথ ডিজিটালাইজেশন প্রয়োজন। দরকার কনটেন্ট তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার-উদ্ভাবন। ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, মিডিয়া ও টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যকার সীমানা ভেঙে পড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে প্রচলিত মিডিয়া কোম্পানি ও নয়া ডিজিটালি নেটিভ প্রতিষ্ঠানেও।

কনজ্যুমার খাতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

ডিজিটালাইজেশন বিপ্লব এনেছে কনজ্যুমার বা ভোক্তাদের আচরণে। কনজ্যুমার ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন ডিজিটাল কনজ্যুমারদের প্রত্যাশা পূরণ করা। কনজ্যুমার ইন্ডাস্ট্রি অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রির তুলনায় বেশি হারে জনগণের সংস্পর্শে থাকে। প্রতিদিন ২০০ কোটি মানুষ একটি গ্লোবাল কনজ্যুমার প্রডাক্ট কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করে। কনজ্যুমার শিল্পে ডিজিটাল ইনোভেশন এক ধরনের ঝাঁকুনি সৃষ্টি করেছে। আজ ব্র্যান্ডের শক্তি চলে গেছে কনজ্যুমারের কাছে, ভ্যালু স্থানান্তরিত হয়েছে ট্র্যাডিশনাল প্লেয়ার থেকে ডিজিটাল ইনসারজেন্টদের কাছে। ফলে কনজ্যুমারেরাই আজ চালকের আসনে।

কনজ্যুমার শিল্পের প্রবণতা পর্যালোচনায় দেখা গেছে– মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যানালাইটিক ও ক্লাউড বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে ও সেবা নেয়ার অভ্যাসে মৌলিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ভোক্তারা এখন কোম্পানিগুলোর টাকা আয়ের কাজকে কঠিনতর করে তুলেছে। কনজ্যুমার ইন্ডাস্ট্রির ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের ফলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন ঘটেছে। বিশেষ করে এই উদ্ভাবন এসেছে পেমেন্ট টেকনোলজি ও লাস্ট-মাইল ডেলিভারির ক্ষেত্রে।

এ খাতে চারটি ডিজিটাল থিম হচ্ছে

০১. কনজ্যুমার ডাটা ফ্লো ও ভ্যালু ক্যাপচার : ইনোভেশন জোরদার করতে ও কনজ্যুমার অভিজ্ঞতার উন্নয়নে কনজ্যুমার ডাটা ব্যবহার করতে কোম্পানিগুলোর জন্য ক্রমবর্ধমান ডিজিটালাইজেশন নানা সুযোগ সৃষ্টি করবে। সফল ডাটা মনিটাইলাজেশন মডেল ডেভেলপ করা হবে কনজ্যুমার শিল্পের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ডাটার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এর নিরাপত্তা দাবি করে। সোসাইটি এরচেয়েও বেশি দাবি করে ডাটা প্রাইভেসি ও ট্র্যান্সপারেন্সি।

০২. এক্সপেরিয়েন্স ইকোনমি : পণ্যের নতুন করে উদ্ভব ঘটবে সেবা হিসেবে। সার্ভিসের উদ্ভব ঘটবে এক্সপেরিয়েন্স হিসেবে। ডাটা সার্ভিস হবে ডেলিভারির ব্যাকবোন। এমন একটি পরিবেশে নয়া রাজস্ব মডেল সৃষ্টির সুযোগ ঘটবে, যেখানে আউটপুট থেকে রেভিনিউকে আলাদা করা যাবে।

০৩. অমনিচ্যানেল রিটেইল : প্রচলিত স্টোরগুলোর রূপান্তর প্রয়োজন হবে ক্রমবর্ধমান অনলাইন পারচেজের দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে। অমনিচ্যানেল স্ট্র্যাটেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে কনজ্যুমার প্রডাক্ট কোম্পানিগুলোকেও সক্রিয় কৌশল নিয়ে নামতে হবে।

০৪. ডিজিটাল অপারেটিং মডেল : স্মার্ট সাপ্লাই চেইন ও স্মার্ট ফ্যাক্টরি গড়ে উঠে সুযোগ করে দেবে পণ্যের মাস-কাস্টমাইজেশনের ও অমনিচ্যানেল এক্সপেরিয়েন্সের। কনজ্যুমার এক্সপেরিয়েন্স মোকাবেলা করায় একটি প্রতিষ্ঠানের অপারেটিং মডেলের সক্ষমতা প্রতিযোগিতার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে হবে কেন্দ্রীয় বিষয়।

বিদ্যুৎ খাতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

বিদ্যুৎ খাতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এ খাতে দ্রুত ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন ঘটলে ২০১৬ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ১.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের ভ্যালু সংযোজনের পথ খুলে যেতে পারে। এজন্য আগামী ১০ বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ১০ হাজার কোটি ডলারের পাঁচটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। ডিজিটালাইজেশনের বিল্ডিং ব্লক, অর্থাৎ সার্ভিস প্ল্যাটফরম, স্মার্ট ডিভাইস, ক্লাউড ও অ্যাডভান্স অ্যানালাইটিকসের মাধ্যমে এ খাতের কোম্পানিগুলো সুযোগ পাবে অবকাঠামোর অ্যাসেট লাইফ সাইকল বাড়ানো, ইলেকট্রিসিটি নেটওয়ার্ক অপটিমাইজেশন ও ভোক্তাকেন্দ্রিক পণ্য উদ্ভাবনের।

এনার্জি টেকনোলজি প্রোভাইডারেরা এই শিল্প খাতের ডিজিটালাইজেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এরা বাজারে ছাড়ছে নানা স্মার্ট টারবাইন ও প্যানেল এবং কমার্শিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য সেন্সর। ইন্ডাস্ট্রিয়াল, কমার্শিয়াল ও রিটেইল কাস্টমারদের জন্য এরা কানেক্টিভিটি প্ল্যাটফরমও ডেভেলপ করছে। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি ও নতুন কোম্পানিগুলো এককভাবে এই শিল্প খাতের প্রান্তিক বিষয়গুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচ্ছে। বেড়ে ওঠা হোম এনার্জি মার্কেট এখন একটি বিবেচ্য বিষয়। এ খাতে শতাধিক কোম্পানি ভ্যালু যোগ করে যাচ্ছে।

এ খাতে চলমান বিভিন্ন ট্র্যান্সফরমেশনকে স্বাগত জানানো হচ্ছে। ফলে এ খাতে ডিজিটালাইজেশনকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই শিল্পের চলমান পরিবর্তনের প্রতি সাড়া দিয়ে নতুন বিজনেস মডেল গড়ে তোলার উদ্যোগকেও সহায়তা দিতে হবে। এ খাতের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ডিজিটাল টেকনোলজির অভাবনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। এটি শেয়ার মালিক ও কাস্টমারের জন্য ভ্যালু সংযোজন করতে পারে। এর রয়েছে পরিবেশগত মূল্য।

আগামী দিনের বিদ্যুৎ কোম্পানি কী আকার নেবে, সেটা কোনো বিবেচ্য নয়। তবে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন হতে হবে এর মৌলিক অংশ। এ ক্ষেত্রের নীতি-নির্ধারকদের এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : আপনি কি এনার্জি সিস্টেম রিডিজাইন করবেন? আগামী দিনের জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কি ধরনের অবকাঠামো ও সিস্টেমের প্রয়োজন? আগামী দিনের বিদ্যুৎ শিল্পে বৃহত্তর ভাগ বসানোর জন্য কোন ব্যবসায়ী ও অপারেটিং মডেল এনার্জি কোম্পানির জন্য পূর্বশর্ত হবে? ▶

বিদ্যুৎ খাতে মূল্য সৃজনের চারটি ডিজিটাল থিম

০১. অ্যাসেট লাইফ সাইকল ম্যানেজমেন্ট : টেকনোলজি সলিউশন সুযোগ করে দিতে পারে রিয়েল-টাইম, রিমোট-কন্ট্রোল বা প্রিডিকটিভ মেইনটেন্যান্সের মাধ্যমে লাইফ সাইকল সম্প্রসারণের। জেনারেশন, ট্র্যান্সমিশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের পরিচালনাগত দক্ষতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

০২. গ্রিড অপটিমাইজেশন ও অ্যাগ্রেগেশন : রিয়েল-টাইম লোড ব্যালেন্সিং, কানেকটেড অ্যাসেট, মেশিন, ডিভাইস ও অগ্রসর মানের মনিটরিং ক্যাপাবিলিটিসমৃদ্ধ নেটওয়ার্ক কন্ট্রোল কিংবা এন্ড-টু-এন্ড কানেকটেড মার্কেটের মাধ্যমে গ্রিড অপটিমাইজেশন সম্ভব।

০৩. ইন্টিগ্রেটেড কাস্টমার সার্ভিস : এনার্জি জেনারেশন ও এনার্জি ম্যানেজমেন্টসংশ্লিষ্ট ইনোভেটিভ ডিজিটালি এনাবল্ড প্রডাক্টস ও সার্ভিস একসাথে বান্ডল করে দেয়া হয় একটি সমন্বিত কাস্টমার সার্ভিসে।

০৪. বিয়োন্ড দ্য ইলেকট্রন : ইলেকট্রিসিটি ভ্যালু চেইনকে ছাপিয়ে হাইপারপারসোনালাইজড কানেকটেড সার্ভিস ভোক্তাদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। ইলেকট্রিসিটি চলে একটি কমোডিটি থেকে অভিজ্ঞতায় রূপান্তর হওয়ার জন্য।

এই ডিজিটাল থিমগুলো শিল্পে ও সমাজে উল্লেখযোগ্য মাত্রার ভ্যালু সৃষ্টির জন্য খুবই সম্ভাবনাময়। অ্যাসেট লাইফ সাইকল ম্যানেজমেন্ট এসব ডিজিটাল উদ্যোগের মধ্যে ভ্যালু সৃজনে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। আগামী এক দশকে তা ৪৮ হাজার কোটি ডলারের ভ্যালু সৃষ্টি করতে পারে। গ্রিড অপটিমাইজেশন অ্যান্ড অ্যাগ্রেগেশন উদ্যোগে শিল্প খাতে প্রাক্কলিত ভ্যালু সৃজনের পরিমাণ ৪৪ হাজার কোটি ডলার এবং সমাজে প্রাক্কলিত ভ্যালু সৃজনের পরিমাণ ১.২ ট্রিলিয়ন ডলার (১ ট্রিলিয়ন = ১ লাখ কোটি)। এ মূল্য সৃজন চলবে গ্রাহকদের জন্য স্মার্ট সার্ভিং চয়েজ সৃষ্টি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পিক ডিমান্ড কমানো (কার্বন উদগীরণ কমানোর মাধ্যমে)। ইন্টিগ্রেটেড কাস্টমার সার্ভিসের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন সম্ভব ৪৪ হাজার কোটি ডলারের।

ভারতের ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন

ভারত এখনও ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের পুরো সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেনি। জনগণের হাতের নাগালের মধ্যে সস্তায় ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগটা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ভারত দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধিতে ডিজিটাল লভ্যাংশ মোটেও যোগ করতে পারবে না– এটি সংবাদ সংস্থা রয়টারের পর্যবেক্ষণ। এমন একটি সন্দেহ কাজ করে, চীন ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি চুরি করে নিয়েছে। বিশ্বের ২০টি সেরা ইন্টারনেট কোম্পানির মধ্যে ১৩টিই আমেরিকান ও ৫টি চীনা। জাপান যুক্তরাজ্যের রয়েছে একটি করে। 'আলিবাবা' হচ্ছে চীনের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স কোম্পানি। এর বাজার মূলধনায়নের পরিমাণ ভারতের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স কোম্পানি 'ফ্লিপকার্ট'-এর বাজার মূলধনায়নের ২৫ গুণেরও বেশি। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক– উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ইনফরমেশন টেকনোলজি সার্ভিস ও দক্ষ মানবসম্পদের সবচেয়ে বড় রফতানিকারক দেশ হওয়া সত্ত্বেও কেনো ভারত এর ইন্ডাস্ট্রিতে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন আনার ক্ষেত্রে চীনের পেছনে পড়ে গেল? তবে দেশটি কি সঠিক অবস্থানে ফিরে আসার জন্য কিছু করছে? কয়েক মাস আগে প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের ডিজিটাল ডিভাইড সম্পর্কিত 'ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট' তথা 'ডব্লিউডিআর'-এ এর কিছু জবাব উল্লিখিত হয়েছে।

ডব্লিউডিআর মতে– ডিজিটাল টেকনোলজি বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এরপরও ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহার করে ডিজিটাল ডিভাইড তথা বৃহত্তর পরিসরের উপকার বয়ে আনার ব্যাপারটি তেমন এগোয়নি। অনেক উদাহরণের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ডিজিটাল টেকনোলজি প্রবৃদ্ধিতে বিস্ফোরণের জন্ম দিয়েছে, বাড়িয়েছে সুযোগ-সুবিধা এবং সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে সেবা সরবরাহের। এরপরও এর সার্বিক প্রভাবে রয়েছে ঘাটতি। আর প্রভাব যেটুকু পড়েছে, তা-ও পড়েছে বৈষম্যহীনভাবে। এই রিপোর্টের অভিমত হচ্ছে– সমাজে ডিজিটাল টেকনোলজির পুরোমাত্রার উপকার পেতে হলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনা, বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগের ক্ষেত্রে। শুধু বড় আকারে ডিজিটাল অ্যাডাপশনই যথেষ্ট নয়। ডিজিটাল বিপ্লবের সর্বোত্তম উপকারটি পেতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশটিকে কাজ করতে হবে এর 'অ্যানালগ কমপ্লিমেন্টে'র ওপর। আর তা করতে হবে বিধিবিধান জোরদার করে তোলে, যাতে করে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত হয়। নতুন নতুন কোম্পানির চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ প্রযুক্তিকর্মী জোগান দেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। সাথে সাথে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যদের আনতে হবে জবাবদিহির আওতায়।

ভারত ও চীনের কর্মকাণ্ড পরিমাপ করে বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে কেনো ভারত এখনও ডিজিটাল বিপ্লবের পুরোপুরি উপকার ঘরে তুলতে পারেনি।

চীনের সাথে বৈপরীত্য : ২০১৪ সাল শেষে ভারতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল ২২ কোটি ৭০ লাখ, সেখানে চীনের ছিল ৬৬ কোটি ৫০ লাখ। ভারতে প্রতি ৫টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টিরও কম প্রতিষ্ঠানে অনলাইনের উপস্থিতি ছিল। অপরদিকে চীনের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানেরই ছিল অনলাইন। ভারতে প্রতি সেকেন্ড ১ মেগাবিট রেসিডেন্সিয়াল ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিস পেতে যা খরচ হয়, তা চীনের তুলনায় ৬ থেকে ১০ গুণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভারতে বয়স, নারী-পুরুষ, স্থান ও আয় বিবেচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ডিজিটাল ডিভাইড চীনের চেয়ে অনেক বেশি। ডিজিটাল আইডি প্রোগ্রাম 'আধার'-এর সুবাদে ভারত সরকারের ডিজিটাল অ্যাডাপশনের ক্ষেত্রে চীনের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু এখন প্রয়োজন এমন একটি প্ল্যাটফরম ব্যবহার, যাতে 'আধার'কে আরও ব্যাপকভাবে ও কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায়।

ভারতের নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ব্যাপকভাবে লিখেছেন 'হিউম্যান ক্যাপাবিলিটি' বিষয়ে। এই ধারণার ব্যাপক ব্যবহার আছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে। দুঃখজনকভাবে, ভারতে শুধু বড় মাপের ডিজিটাল অ্যাক্সেস গ্যাপই থাকেনি, এর রয়েছে বড় মাপের ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটি গ্যাপও। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন মতে– এই ডিজিটাল ক্যাপাবিলিটি গ্যাপ উঠে আসে দুটি উৎস থেকে : সার্বিক বিজনেস পরিবেশ এবং মানব মূলধনের গুণগত মান।

ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক খরচ কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশকিছু প্রশংসনীয় উন্নতি সত্ত্বেও ব্যবসায়-সূচকে ভারত চীনের অনেক পেছনে পড়ে আছে। ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সৃজনশীলতার জন্ম দেয়া ও প্রতিযোগিতার উন্নয়ন। মৌলিক অবকাঠামো, যেমন– এক্সপ্রেসওয়ে, লজিস্টিকস, স্টোরেজ, পোস্টাল ডেলিভারি ব্যবস্থা ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নয়নে ধীরগতি ভারতের ই-কমার্সেও প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এ ছাড়া ডিজরাপটিভ টেকনোলজিক্যাল ইনোভেশনের ক্ষেত্রে, যেমন– মোবাইল মানি অথবা রাইড-শেয়ারিং সার্ভিসের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেগুলেটরদের অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ ভারতের ডিজিটাল স্টার্টআপগুলোর জন্য নতুন বাজারে প্রবেশ ও ব্যাপকতা অর্জন কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতীয় টেকনোলজি ওয়ার্কারেরা যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালিতে উৎকর্ষতার প্রমাণ দিচ্ছে। অথচ ভারতীয় এভারেজ টেকনোলজি ওয়ার্কারদের দক্ষতা প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে আছে। মানব মূলধন উন্নয়নে ভারত বেশ অগ্রগতি অর্জন করলেও এর বিপুল জনগোষ্ঠীর এমন দক্ষতা নেই, যা নিয়ে অর্থপূর্ণ ডিজিটাল ইকোনমিতে অংশ নিতে পারে। ভারতের ২৫ শতাংশ লোক লিখতে বা পড়তে জানে না। চীনের মাত্র ৫ শতাংশ মানুষ লেখাপড়া জানে না। এরপরও আছে লেখাপড়ার মানে পার্থক্য। সর্বশেষ 'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অব এডুকেশন রিপোর্ট' থেকে জানা যায়, ১৬ বছর কিংবা তারচেয়ে কম বয়সী ১০ শতাংশ ভারতীয় শিশু এক অঙ্কের নাম্বার ঠিকমতো চিনতে পারে না।

স্পষ্টতই, ভারতের পক্ষে ডিজিটাল ইকোনমি হয়ে ওঠা এখনও সম্ভব হয়নি। সরকার ঘোষণা করেছে বেশ কিছু নতুন পদক্ষেপ : ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া এবং আধার-এর ইনোভেটিভ অ্যাপ্লিকেশন, যেমন– JAM (Jan-Dhan Yojana-Aadhaar-Mobile trinity) এবং ডিজিটাল লকার্স। এসব পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভারত হারানো সময়ের কিছুটা হলেও উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু একই সাথে ভারতের প্রয়োজন এর ডিজিটাল ইকোনমির মৌল ভিত্তি জোরদার করে তোলা। আরেকটি জরুরি প্রাধান্য হচ্ছে, সব ভারতীয়র জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশের সুযোগ উন্মুক্ত ও নিরাপদ করে তোলা। আন্তর্জাতিক মানে এখনও ভারতে মোবাইল ফোন অ্যাক্সেসের খরচ অনেক বেশি।

শেষকথা

মোট কথা এমন কোনো ইন্ডাস্ট্রি নেই, যেখানে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের প্রভাব পড়েনি বা পড়বে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনায় এনে ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশন থেকে দূরে থাকার অর্থ বোকার স্বর্গে বাস করা। কারণ, সবক্ষেত্রেই এর ইতিবাচক প্রভাব নেতিবাচক প্রভাবের হাজার হাজার গুণ বেশি। এ ছাড়া চারপাশের সব ক্ষেত্রে যেখানে অনবরত ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ঘটে চলেছে, সেখানে কোনো শিল্প খাতবিশেষকে এই পরিবর্তনকে এড়িয়ে চলা এক সময় শতভাগ অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তখন দেখা যাবে পিছিয়ে থাকাটাই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, সময় মতো ডিজিটাল ট্র্যান্সফরমেশনের কাজে মনোযোগ দেয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর এ ক্ষেত্রে ভারতীয় ভুলের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কাজে নামলে আমাদের সফলতার ভাগ বাড়তে পারে কজ